শরৎ এলে জেগে ওঠে ঢাকেশ্বরী

আকাশে তুলার মতো সাদা মেঘ আর থোকা থোকা শুভ্র কাশ ফুল বলে দেয় শরৎ এসেছে। মাসটির অপেক্ষায় মুখিয়ে থাকেন সনাতন ধর্মের অনুসারীরা। এসময় বাবার বাড়িতে আসেন দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা। তার আগমনে ঢাকের বোল, শাঁখের ধ্বনি, কাসার থাল বেজে ওঠে। শুরু হয় শারদীয় উৎসব। এই সময়টায় দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতীয় উপাসনালয় ঢাকেশ্বরী মন্দির। পূজার এই মৌসুমে ঢাকেশ্বরীর দিকে শহরের সনাতন ধর্মের অনুসারীদের থাকে বিশেষ নজর। সপরিবারে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ দর্শনের পর জাতীয় এ মন্দিরে আসেন বিশেষ আগ্রহ নিয়ে। দুর্গতিনাশিনীর আগমনের এই সময় সেজে ওঠে ঢাকেশ্বরী।

অলকানন্দা মালা

অবস্থান ও নামকরণ

ঢাকেশ্বরী মন্দির পলাশী ব্যারাক এলাকায় বুয়েট ছাত্রাবাসের দক্ষিণে ঢাকেশ্বরী সড়কের উত্তরে অবস্থিত। একে বলা হয় ঢাকার ঈশ্বরী অর্থাৎ ঢাকার রক্ষাকর্ত্রী। অনেকের মতে ঢাকেশ্বরী শব্দটি থেকেই এসেছে ঢাকা নামটি। এটিকে ভারতীয় উপমহাদেশ বিখ্যাত যে শক্তিপীঠগুলো আছে সেগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন, ঢাকেশ্বরী নামটি এসেছে কিরীটের ডাক থেকে। কিরীট অর্থ মুকুট আর ডাক অর্থ গহনা। কথিত আছে দেবী সীতার মৃত্যুর পর মাতম করছিলেন মহাদেব। তার মৃতদেহ দুহাতে শূন্যে তুলে নৃত্য শুরু করেছিলেন তিনি। যার ফলে সীতার দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে একান্নটি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যেসকল স্থানে সীতার পবিত্র দেহের অংশগুলো ছড়িয়ে পড়ে ওই স্থানগুলো হয়ে ওঠে এক একটি পীঠস্থান। সীতার কিরিটের ডাক অর্থাৎ মুকুটের একটি মণি আজ ঢাকেশ্বরী মন্দির যেখানে সেখানে এসে পড়ে। ফলে স্থানটি হয়ে ওঠে উপসনা স্থান। কিরিটের ডাক থেকে আসে ঢাকেশ্বরী শব্দটি।

ঢাকেশ্বরী মন্দির নিয়ে প্রচলিত কাহিনি

শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির শুধু হিন্দু ধর্মের বড় নিদর্শনই নয়, এটি ঢাকার অনেক ইতিহাসের নিরব সাক্ষী। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের নিকটও আগ্রহের বিষয় এটি। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কার হাতে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন এই মন্দির। তথ্যটি সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না কেউ। তবে বেশ কয়েকটি কাহিনি জড়িয়ে আছে এই মন্দির নিয়ে। একেক গল্পে একেকজনের বিশ্বাস।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, আদিসুর নামের এক রাজা তার স্ত্রীকে বুড়িগঙ্গার জঙ্গলে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তারপর থেকে অভাগা রানি ওই গহীন জঙ্গলেই দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একটি পুত্র সন্তানেরও জন্ম দেন সেখানে। নাম রাখেন বল্লাল সেন। জঙ্গলেই বেড়ে উঠতে থাকেন বল্লাল। প্রকৃতিকে খেলার সঙ্গী করে কাটতে থাকে তার দিন। একদিন ওই জঙ্গলে একটি মূর্তির সন্ধান পায় বালক বল্লাল। শ্রদ্ধা ভরে মূর্তিটি ছুঁয়ে দেয় সে। ভেবে বসে এই মূর্তিই বনকে সকল দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

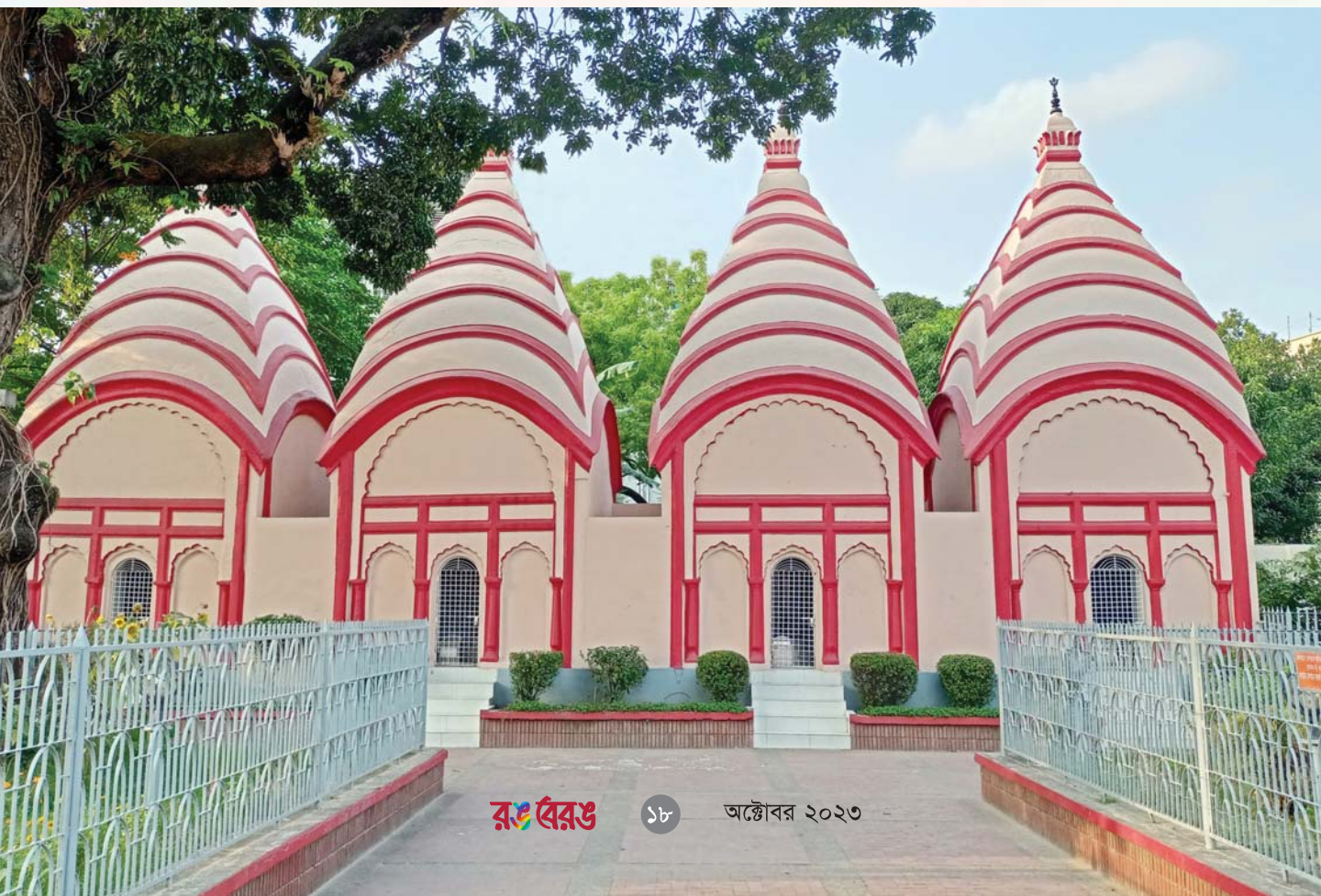

বিশ্বাস করা শুরু করে, তাকেও ওই দেবী রক্ষা করবেন। উপযুক্ত বয়সে বল্লাল সেন যখন রাজকার্য গ্রহণ করেন তখন যে স্থানে প্রতিমা পেয়েছিলেন সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তি পাওয়া স্থানটি জঙ্গলে ঢাকা ছিল বলে দেবীর নামকরণ করা হয় ঢাকেশ্বরী। ফলে মন্দিরের নামও দেবীর নামে ঢাকেশ্বরী মন্দির বলে পরিচিতি পায়।

তবে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উপাসনালয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সৃষ্টির নেপথ্য কারণ বলে প্রচলিত এ কাহিনিতে অনেকেরই বিশ্বাস নেই। অনেকে মনে করেন, শৈশবে বল্লাল সেনের সঙ্গে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে তিনি যখন রাজা তখন একরাতে স্বপ্নযোগে ওই জঙ্গলে দেবীর দেখা পেলে ওই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উৎপত্তি নিয়ে আরও দুটি গল্প প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, রাজা বিজয় সেনের স্ত্রী একবার গিয়েছিলেন লাঙ্গলবন্দ। ফেরার পথে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় বল্লাল সেন। বল্লাল সেন বড় হয়ে স্বপ্নে নিজের জন্মস্থানে এক দেবীর দেখা পান। এরপর ওই দেবীর সম্মানে জায়গাটি মন্দিরে পরিণত করেন। ঢাকেশ্বরী মন্দির নিয়ে প্রচলিত শেষ কাহিনিটি জড়িত মহাদেব ও সীতার সঙ্গে। এটি শুরুতেই বলা হয়েছে।

ইতিহাস কী বলে

এবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র মিলিয়ে নেই। রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঢাকেশ্বরী। এমনটা শোনা গেলেও ওই সময়ের স্থাপত্যগুলোর নির্মাণশৈলীর সঙ্গে এ তথ্যের মিল পাওয়া যায় না বলে দাবি গবেষকদের। এর বিপক্ষে যুক্তিও দাঁড় করিয়েছেন তারা। তাদের দাবি সেন বংশের রাজত্বকালে নির্মিত স্থাপনাতে চুন-বালুর মিশ্রণ ব্যবহার হতো না। এদিকে ঢাকেশ্বরী মন্দির চুন-বালুর মিশ্রণে তৈরি। নির্মাণ শৈলী থেকে বোঝা যায় এটি বল্লাল সেনের আমলে তৈরি হয়নি। এদিকে সেন রাজাদের পতনের মধ্য দিয়ে এ ভূখণ্ডে শুরু হয় মুসলিম শাসন। বাংলা দখল করে মুসলমান শাসকরা। মুসলিম শাসনামলে নির্মিত স্থাপনাগুলো ছিল চুন-বালুর মিশ্রণে নির্মিত। ওই জায়গা থেকে অনেকের ধারণা মুসলিম শাসনামলেই নির্মিত হয়েছে এ মন্দির।

কী কী আছে মন্দিরে

ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে একটি মন্দির ভাবলে ভুল করবেন। এটি মূলত কয়েকটি মন্দির ও সৌধের সমন্বয়ে গঠিত। মন্দিরটি বহির্বাটি ও অন্তর্বাটি নামের দুটি অংশে বিভক্ত। পূর্বদিকে অবস্থিত অন্তর্বাটিতে রয়েছে প্রধান মন্দির, কয়েকটি ইমারত ও নাটমন্দির। অন্যদিকে পশ্চিম দিকে থাকা বহির্বাটিতে একটি পান্থশালা, একটি ঘর ও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। বহির্বাটি-অন্তর্বাটি ছাড়াও কিছু স্থাপনা রয়েছে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এর একটি হচ্ছে দীঘি। বেশ প্রাচীন এই দীঘি। মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এছাড়া দীঘিটির পাড়ে একটি বটগাছও রয়েছে ঢাকেশ্বরীতে।

হিন্দু ধর্মালম্বীদের নিকট অতি পবিত্র শিবলিঙ্গ। বেশ আয়োজন করে পালন করা হয় শিবলিঙ্গের পূজা। ঢাকেশ্বরীতেও রয়েছে এর অস্তিত্ব। মন্দিরের দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে একই সারিতে একই আয়তনে দাঁড়িয়ে আছে চার চারটি শিব মন্দির। এছাড়া মন্দিরের যে প্রশাসনিক ভবন রয়েছে তার দ্বিতীয় তলায় রয়েছে পাঠাগার। একসময় এটি উন্মুক্ত থাকলেও এখন খোলা হয় না। এই পাঠাগারে রয়েছে হিন্দু ধর্মের ওপর লেখা পাঁচ শ বই। শুধুমাত্র বিশেষ পাঠসভা উপলক্ষ্যে খুলে দেওয়া হয় এই পাঠাগার।

বিগ্রহ স্থানান্তর

মানসিংহ বাংলার সুবেদার থাকাকালীন মন্দিরে একটি বিগ্রহ স্থাপন করেন। এতে দুর্গা দেবীর প্রতিমার উচ্চতা ছিল দেড় ফুট। এখানে মহিষাসুর বধের চিরায়িত ছবিটি ফুটে উঠেছে। দশ হাতে দশ অস্ত্র ধারণ করে দুর্গা দাঁড়িয়ে আছেন বাহন সিংহের ওপর। ওই অবস্থায় পশুরাজের ওপর দণ্ডায়মান থেকে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তিনি। তার পাশে আছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। মন্দিরের যত্ন আত্তিতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিল না মানসিংহের। দেবীর বিগ্রহটি দেখাশোনা করতে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন আজমগড়ের এক তিওয়ারি পরিবারকে। তিওয়ারি পরিবারও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বিগ্রহের প্রতি। এমনকি দেশভাগের সময় বিগ্রহটি কলকাতায় নেওয়া হলে তিওয়ারি পরিবারের সদস্যরাও চলে যান কলকাতায়। সেখানে গিয়ে দেবীর দেখাশোনায় রত হন।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় বিগ্রহটি নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে যান মন্দির সংশ্লিষ্টরা। তাদের আশঙ্কা ছিল যেকোনো সময় দাঙ্গার কবলে পড়তে পারে ঢাকেশ্বরী। এতে ভাঙচুরের পাশাপাশি হতে পারে দেবী ঢাকেশ্বরীর অপমান। এই শঙ্কা থেকেই ৮০০ বছরের পুরোনো বিগ্রহটি রাতারাতি কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৮ সালে একটি বিশেষ বিমানে করে অলংকার ও বস্ত্রহীনভাবেই রাজেন্দ্রকিশোর তিওয়ারি (মতান্তরে প্রহ্লাদকিশোর তিওয়ারি) ও হরিহর চক্রবর্তী বিগ্রহটি কলকাতায় নিয়ে যান। কলকাতায় নেওয়ার পরের দুই বছর দেবীর বিগ্রহ রাখা হয় হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রিটে দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরির বাড়িতে। সেখানেই দেবীর পূজা অর্চনা করা হতো তখন। পরে ১৯৫০ সালে বিগ্রহটির জন্য কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন ব্যবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সেইসঙ্গে দেবীর সেবায় কিছু সম্পত্তিও দান করেন তিনি। ওই মন্দিরটিও ঢাকেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত হয়ে ওঠে কলকাতায়। বর্তমানে ঢাকার মন্দিরে দেবীর যে বিগ্রহটি আছে সেটি মূলত মানসিংহের তৈরি বিগ্রহের প্রতিরুপ। ১৯৪৮-এ হেম চন্দ্র চক্রবর্তী নতুন বিগ্রহটি গড়ে দেন। এরপর থেকে মন্দিরে আবার নিয়মিত পূজা অর্চনা শুরু হয়।

মন্দির সংস্কার

মন্দির সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানসিংয়ের নাম। মানসিং ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন। সেসময়ে ঢাকেশ্বরীর ছিল খুব জীর্ণ দশা। শোনা যায়, ধার্মিক মানসিং মন্দির সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির নির্মাণ করেন। তবে এর কোনো যৌক্তিক প্রমাণ মেলেনি। এছাড়া এফ বি ব্রাডলি বার্ট ১৯০৬ সালে তার 'রোমান্স অব অ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটেল' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'বর্তমান মন্দিরটি ২০০ বছরের পুরানো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক হিন্দু এজেন্ট এটি নির্মাণ করেন।'

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ওপর একাধিকবার এসেছে সাম্প্রদায়িক আঘাত। ৪৭-এর পর ১৯৫০-এর দাঙ্গায় আবার আক্রান্ত হয় ঢাকেশ্বরী। এসময় স্বর্ণালংকার লুটের পাশাপাশি মন্দিরের ক্ষয়ক্ষতি করে লুটেরারা। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের শাসনামলের শুরুতে এবং ১৯৬৪-র দাঙ্গায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বেশকিছু সময় পূজা-অর্চনা বন্ধ থাকে। ১৯৭১ সালেও সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়েছে এ উপাসনালয়। রাজাকাররা মন্দিরটি ভাঙচুর এবং লুট করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ২৫ নভেম্বর আবার মন্দিরের উপর হামলা হয়। তবে আশার কথা বর্তমানে জাতীয় এ মন্দির বেশ সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবছরই দুর্গাপূজায় আগমন ঘটে হাজারো দর্শনার্থীর। পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই সম্প্রীতি সৌহার্দের জায়গা থেকে আসেন এই মন্দিরে।